যাবে যদি যাও

অলিউর রহমান চৌধুরী

প্রথম দেখায় হঠাৎ চোখে লাগার মত নয়। উঁচুমত জায়গায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। তবু রাইয়ান দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল ছায়ায় ছায়ায়। আজ কিছুদিন হলো হাওয়া দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে প্রকৃতি। বাতাস জমাট, প্রবাহিত হলেও হয়তো খুব ক্ষীণভাবে - কোনরূপ স্পর্শ টের পাওয়া যায় না। গুমোট হল রুমে বসে থাকা কঠিন।

শনিবারে একটিই ক্লাস, সেও বিকেল তিনটায় শুরু। কালকের মত আজো সে ঘুরছিল গাছে গাছে তাকিয়ে। হাত অন্যমনস্কভাবে চলে গিয়েছিল প্যান্টের পকেটে। ধ্যাত শব্দ মুখ দিয়ে আপনা বের হয়ে এল। এই পরিবেশে সুখটানগুলো হয় খুব আবেশের। অতদূরের দোকানে যাওয়ার সামান্যতম ইচ্ছেও হচ্ছিল না ওর । অথচ ধুমপানের পিপাসা ফিরে ফিরে আসছে। আশেপাশে নজর বুলিয়ে দেখেছে বাচ্চামত ছেলেদের কেউ নেই – এমন কেউ যারা সিগেরেট ফেরি করে বেঁচে। ধুমপান এখন অনেকটা নির্ভয়ে করা যায়, সিনিয়র হয়ে যাওয়ার এই হল সুবিধে।

রাইয়ান এখন জামরুল গাছটার গুঁড়ি ধরে চোখ ছোট ছোট করে তাকাচ্ছে মেয়েটির দিকে। দুরত্ব কম করেও তিনশ ফুট। দৃষ্টিতে বাঁধা তুলে আছে ঘন গাছের সারি। এখান থেকে ঠিক বোঝা না গেলেও রাইয়ানের খটকা লেগেছে একটু। একটি একলা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে উত্তপ্ত দুপুর বেলা। পাশের ছায়ার দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। বসে থাকতে পারত, তাও নয়। কিছুটা জড়সড় ভঙ্গী। দাঁড়ানোর ধরনে মনে হচ্ছে ইচ্ছে করে রোদ পোহাচ্ছে। শীতকালের বিচারে নিত্যদিনের দৃশ্য কিন্তু জৈষ্ঠ্য মাসের জন্য ভীষন বেমানান । মেয়েটির পাশের গাছটাই কাঁঠাল গাছ। সে গাছের ছায়া ঘন কালো। মেয়েটি ছায়ার বৃত্তের নাগাল ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে। হাতের ব্যাগটি নিচে ফেলে রেখেছে অবহেলা ভরে। ইদানিং ক্যাম্পাসের চুরি ছিনতাই বেড়ে গিয়েছে আশংকাজনকভাবে। সে সম্পর্কে মেয়েটিকে অবহিত বা বিচলিত কোনটাই মনে হল না।

ক্যাম্পাসের এই একটি জায়গায় গাছগুলো খুব একাট্টা – কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এমন ঘন প্রাচীর তুলেছে যে দুই এক ছটা রোদের শঙ্কিত প্রবেশ ছাড়া পুরো গোল চত্তরটি ছায়ার এক পুকুরের রূপ পেয়েছে । গোল চত্তর রাইয়ানের নিজ্স্ব দেয়া নাম। সেই প্রথম বর্ষে থাকার অনেক দস্যিপনা করে হলের ছাদে উঠা হত রাতের অন্ধকারে। শক্ত মেঝেতে মাথা পেতে আকাশ দেখা হত, বিরামহীন আড্ডার মাঝেই ধুমপানের হাতেখড়ি। একদিন ভোর হয়ে আসার পর নেমে আসছিল যখন তখনই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। ওদের হলটি ছয় তালা – নিচে থেকে যা কোনদিন নজরে আসেনি উপর থেকে তা একদম পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। গাছগুলো গোলবেঁধে নিজেদের মাঝে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল - ঠিক এমনই মনে হয়েছিল তার। সেই থেকে গোলচত্তর নাম, রুমমেটদের বললেই বুঝে। আজ রুমে কেউ নেই, সবার সকাল থেকে ক্লাস। এই দুইজনের সাথে দেড় বছর ধরে একসাথে আছে ও।

ছোট থেকে গাছের সানিধ্যে বড় হয়েছে রাইয়ান। বাবার শখ ছিল বাগানবাড়ির। সে স্বপ্নের কথা উনি প্রায় বলতেন। সে হয়নি তবে ছোট বাড়িতে যা হয়েছিল তাও কম নয়। আশপাশের মানুষ নাম দিয়েছে - লতাকুঞ্জ। পা ফেলার জায়গা বাদ দিলে শুধু গাছ আর গাছ। দেয়াল টপকে বুনো লতা লুটাচ্ছে মাটিতে, টিনের চাল ঢেকে দিয়েছে চালকুমড়ার চিকন তৃণ। এত সবুজের মাঝে যার বাস তার কিছুটা বৃক্ষপ্রেম অযৌক্তিক নয়।

বেশ কিছুটা সময় মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করে কাটিয়েছে রাইয়ান। এখন সে মোটামুটি নিশ্চিত এই দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে অস্বাভাবিকতা আছে। মেয়েটির পাশের ফোয়ারায় এখন পানি নেই - খটখটে শুকনো। অনেক আগের বানানো ফোয়ারা। এখন নষ্ট হতে হতে দেখায় বদখত সিমেন্টের গামালার মত। বৃষ্টির পানি জমে গেলে কোন না কোন পাখি দেখা যায়ই। এদিকে বেশ কিছু নেড়ি কুত্তা ঘোরাফেরা করে। আজ শোষক সূর্যরাজ। এই তাপ সয্য করার ইচ্ছে পশুকুল বা পাখিরাজিদের কারোরই নেই। জনমানুষ্যশুন্য তাই জায়গাটি। সেখানেই ইচ্ছে করে এমন পাগল করা রোদ খাচ্ছে মেয়ে । অদ্ভুত!

উত্তেজনায় ধুমপানের ইচ্ছে খুব প্রবল হয়ে আসে মাঝে মাঝে, আবার উল্টোটাও ঘটে। হঠাৎ করে ধুমপানের ইচ্ছে চলে গেছে রাইয়ানের। আগ বাড়বে কি বাড়বে না এমন দোটানায় পড়ে গেছে। কিছুটা ভাবতে ভাবতেই শেষমেষ সে এগুচ্ছে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে। এতক্ষণ পরিষ্কার হয়নি কাছে আসতে বুঝা গেল মেয়েটির সর্বাঙ্গ ভেজা। গোলাপী জামা গায়ের সাথে আঁটসাঁট হয়ে আছে। একটু পর পর মেয়েটি জামা টেনে ধরে ধরে গা থেকে ছড়াচ্ছে। আরক্ত মুখ। সাজ সজ্জায় কোন বাহুল্য নেই। ঠোঁটের উপর হালকা গোলাপী লিপস্টিকের ছোঁয়া থাকতে পারে। আবার সেটা স্বাভাবিক রঙও হতে পারে। এছাড়া একদম সাধারন বেশভুষা। সৌন্দর্যের দাবীতে এই মেয়ে আরো সাজার যোগ্য। তবে কিছু সৌন্দর্য এমন সাদামাটাই ভাল।

মেয়েটির এমন রোদ মাথায় করে দাঁড়ানোর রহস্য সম্ভবত রাইয়ান ধরতে পেরেছে। নির্দিষ্ট কোনদিকে তাকিয়ে নেই। এ থেকে সে আন্দাজ করে নিল মেয়েটি কারো জন্য অপেক্ষা করে নেই। অবশ্য থাকলেও সে এগিয়ে যেত। মনে হচ্ছে বেশ বেকায়দায় পড়েছে। ইশ! একদম কাক ভেজা অবস্থা।

- আপনি ঠিক আছেন তো?

প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠলো মেয়েটি। আপন ভাবনায় ছিল হয়তো। ধ্যান ভেঙ্গে ভ্রু উঁচু করে যেভাবে তাকালো তাতে ছোটবেলায় দেখা রিতা খালার কথা মনে করিয়ে দিল। রাইয়ানের ইচ্ছে ছিল না এভাবে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষ কত ধরনের বিপদেই না পড়ে। মেয়েটির ঠোঁট একটু নড়েই থেমে গেল। কিছু বলতে গিয়েও যেন সিদ্ধান্ত নিল অযাচিত কারো সাহায্য সে নিবে না। রাইয়ান এতে কিছু মনে করল না। মেয়েটির দাড়ানোর ভঙ্গীতেই কোথায় যেন লেখা আছে অযথা কথা বলতে অভ্যস্ত নয়। তবে রাইয়ান জানে এটাই স্বাভাবিক, উলটো মেয়েটি যদি হেসে হেসে তার সমস্যার কথা বলে দিত সেটাই অস্বাভাবিক হত। রাইয়ানের বদ্ধমূল ধারনা মেয়েটি কোন বিপদে পড়েছে। এই দুপুরে একা একা গায়ের ভিজে কাপড় শুকাচ্ছে এটা কোন ভাবেই স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে পড়ে না। সে পাশ থেকে ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি তাকে খুব বেশি পছন্দ করছে না, আবার অপছন্দ করছে তাও মনে হচ্ছে না।

-আপনি একদম ভিজে গেছেন দেখি।

কিছুটা নিরবতা। মেয়েটি ইচ্ছে করেই উত্তর দিচ্ছে না রাইয়ান বেশ বুঝলো। একই মন্তব্য করল আবার। মেয়েটির উত্তর এলো পরমুহূর্তেই।

-আপনার কি এতে আনন্দ হচ্ছে?

কথার মধ্যে রোষ ফুঁটে বেরুলো। রাইয়ান মানুষের রাগ সামলিয়ে অভ্যস্ত। ঠেসটুকু গায়ে না মেখে আগের মত করেই বলল

-আপনি নতুন?

- সে জেনে আপনার কি দরকার?

-আপনার সাহায্য দরকার হলে যেন করতে পারি।

-আমি কি আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছি?

- আমার উনিভার্সিটি, আপনি যদি বহিরাগত হন তাহলে সাহায্য করাটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

- সে আপনার করা লাগবে না আর, আপনার সহপাঠীরা খুব ভাল মত তাদের কর্তব্য পালন করেছে।

বলেই মেয়েটি যেন একটু কেঁপে উঠলো। রাইয়ানের মনে একটা ছোট আশঙ্কা এলো। সেটা প্রকাশ না করে জানতে চাইলো

-আপনি একা এসেছেন?

মেয়েটির মুখে রাগের ছটা। আবার ঈষৎ ঠোঁট নড়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। ও যেন মনস্থীর করতে পারছে না। দুই মুখী চিন্তা এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে।

রাইয়ানও অনড়। নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে রইল ধর্য্য ধরে। রাইয়ানের মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকে। হাল ছাড়বে না বুঝতে পেরেই মেয়েটি বোধহয় ঠিক করল উত্তর দিবে সে

- আমাদের উনিভার্সিটি থেকে এসেছি।

রাইয়ান তখনো নিশ্চুপ। উত্তরের বাকিটা শুনতে অপেক্ষা করছে।

- আমার সাথের সহপাঠীরা আছে।

- থাকলে দেখতে পাচ্ছি না যে?

মেয়েটির ইতস্তত ভাব যায়নি এখনো। উত্তর দিতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই সময় নিল

- ওরা ল্যাবে কাজ করছে।

- আপনি গেলেন না?

-যাব কি করে? এই অবস্থায় যাওয়া যায়?

ফুঁসে উঠলো মেয়েটি।

রাইয়ান হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গীতে বলে উঠলো

-ঠিক সেটা বলিনি, আসলে আপনার এই হাল হল কি করে?

-কর্তব্য পালন করেছে আপনার সহপাঠীরা!

- আমার সহপাঠীরা এই ধরনের কাজ করবে বলে মনে হয় না। জুনিয়র ছেলেদের কাজ নিশ্চয়।

- থামাতে তো কেউ এগিয়ে এলো না।

-ওরা কি সংখ্যায় অনেক ছিল?

-হবে পনেরো-বিশ জন, উস্ৃঙ্খল ছেলে। ভাবাই যায় না এরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

মেয়েটি আগের চাইতে কথাবার্তায় সাবলীল হয়ে উঠছে।

-এতগুলো ছেলের বিপক্ষে খুব কম ছেলেই কথা বলতে চাইবে। হোক না জুনিয়র।

-তাই বলে...

- কোন ইউনিভার্সিটি তে পড়েন?

-ইস্ট -ওয়েস্ট।

-কোথায় এটা?

মেয়েটির মধ্যে উত্তর দেওয়ার লক্ষণ নেই।

-কেনো এসেছিলেন জানতে পারি?

এবারো মেয়েটি নিশ্চুপ।

-বলতে পারেন, কোন সাহায্যে আসতেও তো পারি।

- আমি সাহায্য চেয়েছি?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে চাইলো মেয়েটি।

রাইয়ান একটুখানি ভেবে বলল

- দেখুন ঘটনা ঘটার সময় কাছে ছিলাম না, হলে...

- থাকলেও কিছু করতেন না। সবাই সঙ সেজেই ছিল।

-আচ্ছা কিছু না হয় করতে পারতাম না মানলাম, তবে দূঃখ হচ্ছে আপনার জন্য।

-তার প্রয়োজন দেখছি না।

- আপনি অযথা আমার উপর রেগে আছেন।

-নাহ।

- তাহলে বলুন কি করতে পারি?

- কিছু করার নেই আপনার। আমি দাঁড়িয়ে আছি, রোদে একটু শুকিয়ে গেলে চলে যাব।

- আমি কিন্তু কাছেই থাকি, আমার হল ঐ গাছগুলোর পেছনের দালানটি।

মেয়েটি এবার সরাসরি তাকালো, যেন বুঝার চেষ্টা করছে কি বলতে চাইছে রাইয়ান।

- আমি চট করে যাব আর আসব। অপেক্ষা করুন।

মেয়েটি বেশ অবাক হয়েছে, চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো।

-এই শুনুন, আমার জন্য আপনার কিছু করা লাগবেনা।

রাইয়ান মুচকি হাসি দিয়ে ঘুরে হাঁটা দিয়েছে ততক্ষণে।

গাছের আড়াল হতেই রাইয়ানের পায়ে চিতার ক্ষিপ্রতা। দুই লাফে সিঁড়ি টপকে উঠে গেলো দ্বিতীয় তলায়। আসার পথে বার কয়েক ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে মেয়েটিকে। নিজের রুমের দরজার তালা খুলল চোখের পলকে। ট্রাঙ্ক হাতড়ে টাওয়েল বের করে নিয়ে ফির ছুটলো। ত্রস্থ পায়ে সিড়িতে পা দেয়ার আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাছের ফাঁক গলে চেয়ে নিল আরেকবার। গোলাপী আভা চোখে পড়ছে - মেয়েটি আছে। নেমে আসার সময়ও সমান ক্ষিপ্রতা। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই ধীর হল সে গতি।

কাছে আসতে হাত বাড়িয়ে বলল

-নিন মুছে ফেলুন।

মেয়েটি একদম অপ্রত্যাশিত আচরণ করল না। যেন সে জানতই এমন কিছুই ঘটতে যাচ্ছে। কিছুটা সহজ ভঙ্গীতে বলল

- আপনার টাওয়েল আমি ব্যবহার করব কিনা জিজ্ঞেস করে যেতে পারতেন।

- টাওয়েল আমার, তবে অব্যবহৃত। একদম নতুন কেনা।

- থাক এরই মধ্যে অনেকটা শুকিয়ে গেছে, এর আর দরকার হবে না। ধন্যবাদ।

- আপনি আমার বন্ধু হলে নিশ্চয়ই নিতেন।

-বন্ধু হলেই নিতাম এতটা জোর ধারনা করছেন কেনো ? আমি কিছু ব্যপারে খুঁতখুঁতে। কিছু মনে করবেন না।

রাইয়ান টাওয়েল গোটাচ্ছে, এরই ফাঁকে জিজ্ঞেস করল

-এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ, ঠান্ডা লাগাতে পারে। গরম ঠান্ডার প্রকোপ বেড়েছে চারদিকে। অনেকেই অসুস্থ হচ্ছে। নিতে পারতেন।

মেয়েটি প্রত্তুতরে শুধু শুকনো হাসি হাসল।

রাইয়ান প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করল

-আপনি নিশ্চয় বাসায় থাকেন?

-জ্বী?

যেন বুঝতে পারেনি প্রশ্ন।

-না মানে হলে তো আর থাকেন না।

-ওহ, জ্বী বাসায় থাকি।

- জানিয়েছেন?

-জ্বী? ওহ এই ঘটনার কথা? জানানোর তেমন কি আছে?

- এসে নিয়ে যেতে পারতো অন্তত গাড়ী করে।

- আব্বু কাজে, কেউ নেই তেমন বাসায়। আর আমাদের গাড়ী নেই।

- আমি তো জানতাম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সবারই গাড়ী থাকে।

মেয়েটি একটু সজোরেই হেসে দিল।

- আপনি বুঝি ঢাকার বাইরে বড় হয়েছেন?

- হঠাৎ এই প্রশ্ন?

- আপনার ধারনা নেই তেমন সেজন্য বললাম । আমাদের উনিভার্সিটির নামও শুনেননি বলে মনে হল।

এবার রাইয়ান হাসছে।

- বাসায় জানালে ভাল হত।

- সে উপায়ও নেই।

- কেনো মোবাইল নেই আপনার?

-থেকেও না থাকার মত অবস্থা। পানিতে ভিজে অকেজো।

-খুব বাজে অবস্থা দেখছি। আমার কাছে ফোন আছে।

বলেই রাইয়ান তাকিয়েছিল ওর হলের দিকে।

-আপনি ব্যস্ত হবেন না। এখন জানালে চিন্তা করবে উলটো। তার চেয়ে বরং একেবারে বাসায় গিয়ে বলব।

- অনেক বদনাম করবেন আমাদের ইউনিভার্সিটির তাই না?

হাসতে গিয়েও সামলে নিল মেয়েটি। দৃষ্টি সরু করে বলল

- করাই উচিৎ। ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা দিনে দুপুরে এত বখাটে আচরন করল আর কেউ কিছু বলতে এগিয়ে এল না। এটা অকল্পনীয় লাগছে।

- কি করবেন বলুন, ঘুনে ধরা সমাজ, অকল্পনীয় দৃশ্যই এখন স্বাভাবিক।

- বাইরে হলে এক কথা ছিল, নিজস্ব ক্যাম্পাসেও কি এতটুকু জোর দেখাতে পারত না?

- সবার প্রাণের মায়া আছে।

- সেজন্য নৈতকতা জলাঞ্জলী দিতে বলেছে?

- কঠিন কথায় অনেক তর্ক হতে পারে। সে কথা বাদ দিন। আপনার সহপাঠীরা দাঁড়ালো না কেন?

- অনেক গুরুত্বপূর্ন ল্যাব ওয়ার্ক।

- আপনার ভালোই ক্ষতি হল তাহলে।

- সে কি আর বলতে? ঠিক কি ভাবে পুষিয়ে নিব জানি না।

- শুধু আপনাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল কি?

- অনেকটা তেমনই ধরতে পারেন।

-আপনিই কি এক মাত্র মেয়ে ছিলেন দলে?

- আরে নাহ, আমি সহ ছয়জন।

-ছেলে ছিল না দেখেই কি এমন করেছে?

-ছেলেও ছিল আট-দশ জন।

- বেশ বড়সড় দল দেখি। ল্যাব ওয়ার্ক করার জন্য এখানে ছুটে এলেন কেন? আপনাদের ল্যাব সুবিধা যথেষ্ট নয়?

- তা আছে তবে এগুলো আমাদের স্টাডির অংশ, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে করতে হয় মাঝে মাঝে।

- ল্যাব যেহেতু বললেন সাইন্সের স্টুডেন্ট বুঝতে পারছি। কোন ডিপার্টমেন্ট?

- ফার্মাসি।

- সে তো শুধু ঔষধ নিয়ে ঘাটাঘাটি।

বলার ধরনে হাসির মত ভঙ্গী করল মেয়েটি।

- মুখ বিকৃত করার কিছু নেই। ঔষধ মানেই তো কিছু কেমিক্যালের সংমিশ্রন।

-মুখ বিকৃত হয়েছিল নাকি? ছোট বেলার অভিজ্ঞতা দেখছি এখনো ভুলিনি। যা তেঁতো স্বাদের ঔষধ, ভুলতে পারব বলেও মনে হয় না।

- হয়েছিল কি?

-একটা দু'টা রোগ নাকি? রোগশোকে ভুগে ভুগে বড় হয়েছি। দেখছেন না এখনো কেমন চিমসি মেরে আছি।

-তখন খুব তো বললেন ঘটনার সময় উপস্থিত হলে কি না কি করে ফেলতেন।

-শুকনা বলে মারামারি আসে না তা নয়। খুব ভালোই আসে বরং। কত জায়গায় লেগে গিয়েছি।

- শুধুই লেগেছেন নাকি কাজের কাজ কিছু করেছেন?

মেয়েটি এখন অনেক সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছে।

-সব জায়গায় পারিনি তবে সাফল্যের হার খারাপ না। এই হাত দিয়ে অনেক দাঁত ফেলেছি বুঝলেন।

রাইয়ানের হাত পাকানোর ভঙ্গীতে হেসে ফেলে মেয়েটি। রাইয়ানই আবার বলে

-এখন কি করবেন?

-দাঁড়িয়ে থাকব, চলার মত অবস্থা হলে বাসের খোঁজে বের হব।

- সে কি? আপনার বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করবেন না?

-ওদের ল্যাব তো মাত্র শুরু হল, এগুলো লম্বা লম্বা সেশনে চলে, বিকেলের আগে শেষ হবে না।

- সবে শুরু হলে আপনিও ল্যাবে চলে যাচ্ছেন না কেনো?

-আধ ঘন্টার উপরে পার হয়ে গেছে, আর এই কাপড়ে এত বেলা করে থাকলে ঠান্ডা লাগবে।

- আধ ঘন্টার উপরে হল তাও বলছেন সবে!

- এই ধরনের ল্যাব কাজ চার/পাঁচ ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলে। সেই তুলনায় মাত্রই শুরু হয়েছে বলা যায়।

- আপনাকে এভাবে একা ফেলে আপনার বন্ধুরা গেল কি করে?

- আমিই ওদের জোর করে পাঠিয়েছি।

- তা অবশ্য ভাল করেছেন, সবাই মিলে মিস করার অর্থ নেই।

- সেটাই।

-আপনি বাস কোথা থেকে নিবেন জানা আছে?

- সামনে গিয়ে ডানে মোড় নিলে তো বোধহয় সড়ক।

বলার ধরনে অনিশ্চয়তা ফুঁটে উঠে। চোখ পিটপিট করে তাকায় মেয়েটি। রাইয়ান হাসতে থাকে।

- তাহলেই সেরেছে, ভিতরের জংগলে গিয়ে পড়তেন।

-তাই?

বিস্ময় প্রকাশ পায় মেয়েটির কণ্ঠে।

- কিন্তু মনে হল এদিক দিয়েই এসেছিলাম...

মেয়েটি ইতস্তত করছে।

-নতুন নতুন সব দিকই এক রকম মনে হয়। আসলে এসেছেন আপনার ঠিক পেছন দিক দিয়ে। ওখান থেকেই আপনাকে বাস ধরতে হবে।

- অনেক ধন্যবাদ। আমি অবশ্য এখন উঠব। অনেক করলেন।

- করার চেষ্টা করেছি বলতে পারেন করতে আর পারলাম কৈ?

- সেই বা কয়জন করে । অসহায় পেলে খুব এক হাত দেখিয়ে দেয়।

-চলুন আপনাকে এগিয়ে দেই।

- তার সত্যি প্রয়োজন হত না।

- আমি সেদিকেই যাচ্ছিলাম আপনাকে এমন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমেছিলাম।

মেয়েটি আর কিছু না বলে ব্যাগ তুলে নিল কাঁধের উপর।

- আচ্ছা বলুনতো কি মজা পেল এই করে?

- ছেলেগুলোর কথা বলছেন?

- হ্যাঁ, চরম অসভ্য।

- ওদের আজ বোধহয় রেগিং ডে ছিল।

- সে তো বুঝেছি, আমাদের কে যেভাবে আক্রমন করল এটা মানা যায় না।

- দেখেছে আপনারা বাইরে থেকে এসেছেন।

- আরে হ্যাঁ তাই তো একদম পেয়ে বসল।

- আপনাদের সাথের ছেলেগুলো খুব নিরীহ ধরনের নাকি?

- কি যে বলেন, আপনাদের এখানে যারা ছিল তাদের চাইতে অনেক বেশি প্রতিবাদ আমাদের সাথের ছেলেগুলোই করেছে। আমরা মেয়েরা মিলে অনেক কষ্ট করে শান্ত করেছি। না হলে কি না কি হত কে জানে।

-তাও বলব ভাগ্য ভালো আপনার, পানিতে রঙ ছিল না বেঁচে গেছেন।

- এমন ভাবে বলছেন যেন রঙ মিশিয়ে...

রাইয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটির কথা থেমে যায়। মাথা দোলাতে দোলাতে বলে

- অবিশ্বাস্য! এসব কি নিত্য দিনের ঘটনা নাকি?

- তা নয় কিন্তু রেগিং ডের দিন এসব হয় টয়।

- এক ধরনের উৎসবের মত শোনাচ্ছে!

- প্রথম বর্ষের ছেলেদের মধ্যে উন্মাদনা বেশি থাকে, ওদের কেউ কেউ এসব উত্তেজনার বশে করে ফেলে পরে পস্তায়।

কথা বলতে বলতে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ায় দু'জন। ক্ষণিকের জন্য মনোযোগ সরে যায় মেয়েটির।

-কোন বাস নিব বলুন তো?

- এসি যাবেন নাকি নন এসি?

- এসি করে এসেছি, তবে ঠান্ডা লেগে যাবে এখন। নন এসিই বোধহয় ভাল হয়।

-শীতল এ করে যান তাহলে। ঐ যে দেখছেন শীতলের কাউন্টার। গাবতলীতে নেমে গিয়ে সি.এন.জি নিয়ে নিবেন।

- এই যাহ! আপনার নাম জানা হল না।

- রাইয়ান। আপনার?

- নন্দিতা। কি যেন বলছিলেন তখন। ওহো, মনে পড়েছে। পস্তায়? সে কি করে জানলেন? মনে তো হল না এদের মধ্যে একটুও খারাপ লাগা ছিল। একবার নয় বার বার এসে বালতি বালতি পানি ছুঁড়ে ফেলেছে গায়ে। নোংরামির চরম। জানেন আজ মনে হচ্ছে বয়েস অনেক বেড়ে গেছে আমার। এত বাজে অনুভূতি হয়নি আগে।

- সে জানি। আপনার আজ কেমন লাগছে তা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি। আগে বুঝিনি। সেজন্যই পস্তাচ্ছি।

রাইয়ানের নতমুখে আস্তে করে বলা উত্তরে থরথর করে ভূমিকম্প হল যেন আশেপাশে। নন্দিতা সম্পুর্ন স্তব্ধ।

মুখটা অল্প হাঁ হয়ে গেল, দু'চোখ বিস্ফোরিত।

- আ...আপনি আজ সেই দলে ছিলেন?

- নাহ সে অনেক আগের কথা। প্রথম বর্ষের রেগিং ডে তে...

কথা শেষ হওয়ার আগে আগুন ঝরালো নন্দিতার চোখ।

-ছিঃ, আপনিও!

ঝড়ের বেগে ঘুরলো মেয়েটি। *আপনিও* বলার মধ্যেই নন্দিতা বুঝিয়ে গেছে রাইয়ানকে সেই দলের কেউ ভাবতেই পারেনি। রাইয়ান নিজেও ভাবেনি তবে কি হয়েছিল সেদিন, কেন সবার তালে তাল মিলিয়েছিল জানা নেই। একটু আগে পরিচয় পেয়েও নন্দিতাকে রাইয়ানের বহু দূরের অজানা এক মেয়ে মনে হচ্ছে। মেয়েটি ব্যস্ত রাস্তা পার হচ্ছে বলে মনে হল না। এদিক ওদিক তাকালো না একটুও। হনহন করে পিচ ঢালা রাস্তার উপর দিয়ে যেনো উড়ে যাচ্ছে সে। চট করে দেখে নিয়েছে রাইয়ান ভারী ভারী যান নেই এই সময়টায়। তবে এই ব্যস্ত রাস্তায় দূর্ঘটনা ঘটা মুহুর্তের ব্যপার।

নন্দিতার প্রতি পদক্ষেপে বুক কেঁপে গেলো রাইয়ানের। এই বুঝি বা চাপা পড়ে মেয়েটি। ঐ পাড়ে ঠিক মত পৌছে গেল দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। নন্দিতা ফিরে দেখল না একটি বারও। মূহুর্ত পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল শীতলের কাউন্টারের ভিতর।

বাবার কথা মনে এলে চোখ জ্বালা করে উঠে রাইয়ানের। এক মাস আগেও ছিল মানুষটি, আজ নেই। ছোটবেলায় কত নীতির কথা শুনেছে। মনে হত কিচ্ছু মনে নেই, অথচ এখন ডালপালা বিস্তার করে মনের দুয়ার, ঘর ছেয়ে ফেলেছে সেসব বাক্য - ঠিক যেন লতাকুঞ্জের মত। উজ্জ্বল বর্নময় হয়ে ভাসে মনের পর্দায় - *যে পাপ কাজ করেছো তার দ্বিগুন মূল্যের ভাল কাজ কর।*

রাইয়ান আজ ইচ্ছে করে নিজের দোষী দিকটি তুলে ধরেছে। জানত প্রাপ্য এমনই হবে। তাও টনটন করছে বুকটা। ঘনঘন শ্বাস নিতে নিতে আপন মনে বলল।

-আর একজন দরকার।

সিগেরেটের পিপাসা ফিরে এলো আচমকা। রাস্তার ওপাড়েই দোকান, সেদিকে শুধু শুকনো নির্লোভ দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে রইল সে। দোকানের চালার উপর কালো কুচকুচে দাঁড়কাকা। বিকট শব্দে হাইড্রোলিক হর্ন বাজিয়ে গেল এক মদ্য ট্রাক। কাকটি নিঃশব্দে উড়ে যেতেই রাইয়ান তাকালো বাস টিকিট ঘরের দিকে। শীতলের বাসটি ধীর পায়ে রাস্তায় উঠে এগুচ্ছে। রাইয়ান ঘুরলো, হাঁটা দিল হলের উদ্দেশ্যে। হাতে ভাঁজ করা টাওয়েল। দুপুরটা আজ সত্যি অনেক এলোমেলো করে দিয়ে গেল তাকে।

01/06/2008